তারিখ ··20 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি সৃজনশীলতার অন্তরায়

দৈনিক জনকণ্ঠ

ডঃ আলী আসগর

নকল প্রবণতা দূর করার জন্য যে সব সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা সীমিতকরণ, পরীক্ষা কেন্দ্রের স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় ও অতি কঠোর তত্ত্বাবধান ইত্যাদি। মনে করা যাক এসব ব্যবস্থা নিয়ে নকল বন্ধ করা গেল। কিন্তু তাতে নকল প্রবণতার যে মূল ক্ষতিকর প্রভাব শিক্ষার উপরে তা কি দূর হবে? নিশ্চয়ই নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— যে মুখস্থ করে এবং যে নকল করে তারা দু'জনেই এক গোত্রের। প্রথম জন প্রাচীনপন্থী, সে কষ্ট করে নকলটা মাথার মধ্যে ধারণ করে রাখে। দ্বিতীয় জন কিছুটা আধুনিক, সে ছাপাখানার সাহায্য নিয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষা ব্যবস্থায় মূল ত্রুটি হলো— সৃজনশীলতা ও মৌলিকতা যাচাই করার কোন ব্যবস্থা আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতিতে নেই। নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা প্রবর্তন করে নকল প্রবণতা হ্রাস এবং পরীক্ষার ফলের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি যে সমাধান করা হয়েছে সেটিই বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই এখানে।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষার ফলকে পরীক্ষক নিরপেক্ষ করে তোলা। অর্থাৎ প্রশ্নটি এমন হবে যার উত্তর বিচার করতে পরীক্ষকের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা এবং অনির্বচনীয় ব্যক্তিত্বের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো যেন ক্রিয়াশীল না হয় প্রশ্নের জবাব যাচাই করতে। প্রশ্ন ও জবাবের এই নৈর্ব্যক্তিকতার শর্ত স্বভাবতই পরীক্ষার্থীর সৃজনশীলতাকে পরীক্ষণ অযোগ্য করবে। কারণ, একটি সৃষ্টিশীল মনের গভীর, জটিল ও বিচিত্র প্রতিচ্ছবি ধারণ করতে এবং উপলব্ধি করতে আর একটি গভীর ও সৃজনশীল মন চাই। মনের সঙ্গে মনেরই শুধু মিথস্ক্রিয়া ঘটতে পারে। সৃজনশীলতাকে সৃজনশীলতা দিয়ে পরিমাপের যে অনিশ্চয়তা থাকে তাকে অস্বীকার করলে বা বর্জন করতে চাইলে সৃজনশীলতাকেও অস্বীকার করতে হবে। নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত জবাব স্বভাবদই যান্ত্রিকভাবে যাচাই করা যায়। আর সে জন্যই কম্পিউটার ব্যবহার করেও প্রশ্নে যাচাই সম্ভব। বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য কম ঘটবে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে। কিন্তু যা পৌনঃপুনিক তাই সত্য নয়। বরং একটি অনিশ্চয়তার একটি ব্যাপার আছে বলে মনে হয়।

কোন পরীক্ষার্থীর সত্যিকার মেধা, বিশেষ করে তার সৃজনশীলতা, প্রেরণা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ যাচাই করতে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা কার্যকর নয়। এখানে বিভিন্ন পরীক্ষকের বিচারের মধ্যে পার্থক্য কমাতে গিয়ে পরীক্ষার্থীর জ্ঞান সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়ে পড়ছি আমরা।

ব্যাপারটি আরও একভাবে দেখতে পারি আমরা। পরীক্ষার সব প্রশ্নের জবাব যেখানে বাধ্যতামূলক, সেখানে পরীক্ষার্থীর জবাব থেকে সে কি জানে তাই শুধু আমরা জানতে পারি না, সে যা জানে না সেটাও আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু এক্ষেত্রে সব পরীক্ষার্থী সমান সুবিচার লাভ করে না। কিছুটা ভাগ্য অর্থাৎ সম্ভাবনার নিয়ম কাজ করে। পরীক্ষকের প্রশ্ন নির্বাচনের ওপরে বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে পরীক্ষার্থীর ফল, কারণ পরীক্ষার্থীর প্রশ্ন বাছাই করার সুযোগ থাকে না।

পরীক্ষা পদ্ধতির এই অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলো কাজে লাগাতে হলে প্রতিটি পরীক্ষার উদ্দেশ্য আগে থেকেই নিরূপণ করা প্রয়োজন। পরীক্ষার ফলের মধ্যে যেন এই উদ্দেশ্যগুলো প্রতিফলিত হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পরে। অন্যদিকে যে মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়, পরীক্ষার ফলের মধ্যে [illegible] উল্লেখ অবান্তর। শিক্ষাদানের ও শিক্ষা গ্রহণের মতন শিক্ষার [illegible]ন যাচাই অর্থাৎ পরীক্ষাও একটি সৃজনশীল ও বুদ্ধিগত ব্যাপার হতে হবে।

বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, পরীক্ষার্থীদের মেধা যাচাই আনুভৌমিক। অর্থাৎ প্রশ্নপত্রগুলোর মানগত ধাপ প্রায় অভিন্ন। সব প্রশ্নই প্রায় একই রকম কঠিন বা সহজ। শিক্ষার্থী কতগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম সেটা এক্ষেত্রে নির্ভর করে কত বেশি প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত এবং কত ভাল করে সে মুখস্থ করেছে তার ওপর।

কিন্তু প্রশ্নগুলো যদি জটিলতার ক্রমানুসারে সাজান যায়, সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, মেধা ও বুদ্ধির ধাপগুলো অনেক নিশ্চিতভাবে যাচাই করা সম্ভব হবে। পর্বত আরোহণের মতোই কতই উর্ধে উঠতে পারে পথিক তার বিচার হবে এক্ষেত্রে। পরীক্ষার্থীর নিজস্ব অন্তর্নিহিত দক্ষতা ও জ্ঞানের গভীরতার ভিতরে সে তেমনি পৃথক হয়ে পড়বে অন্যদের থেকে। এ ধরনের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন অবশ্যই অত্যন্ত সৃজনশীলতার সঙ্গে করতে হবে।

বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় অনেকগুলো প্রশ্ন থেকে কয়েকটি প্রশ্নকে বাছাই করে নিতে পারে পরীক্ষার্থী। যে প্রশ্নগুলোর সে জবাব দেয় তার ভিত্তিতে তার জ্ঞানের বিচার হয়। কিন্তু যে প্রশ্নগুলোর সে জবাব দিল না, সে সম্পর্কে তার অজ্ঞতা যাচাই করার কোন পথ থাকে না। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের বিচার হলো কিন্তু তার অজ্ঞতার যাচাই হলো না। মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু এ রকম ঘটে না। আর সেই কারণেই মৌখিক পরীক্ষা অনেক বেশি নির্ধারক পরীক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞানের। সব প্রশ্নেরই জবাব দেবার প্রচলন ঘটলে ছাত্রের পক্ষে বাচাই করে মুখস্থ করার প্রবণতাও কমবে।

রচনামূলক প্রশ্নের জবাব ছাত্ররা যে মুখস্থ করে দেয় এই ব্যাধি দূর করবার একটি পদ্ধতি হলো প্রশ্নপত্রকে গতানুগতিক না করে সুনির্দিষ্টভাবে ও বিস্তৃতভাবে সংলাপের মতন দীর্ঘ প্রশ্ন তৈরি করা। অর্থাৎ প্রশ্নের প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি ধাপ ও এর কাঠামো দীর্ঘ সময় ধরে বুঝে, মেপে সাজিয়ে উত্তর দিতে হবে পরীক্ষার্থীকে। এক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র স্বভাবতই দীর্ঘ হবে, কিন্তু পরীক্ষার্থী যতটা সময় নেবে প্রশ্ন বুঝতে ও চিন্তা করতে সে অনুপাতে জবাব হবে সংক্ষিপ্ত। এক্ষেত্রে মুখস্থ বিদ্যার চাইতে প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে উপলব্ধি ও জ্ঞানের গভীরতার বেশি প্রয়োজন পড়বে।

পাঠ্যসূচীতে যা কিছু অন্তর্ভুক্ত তার সব কিছু সমান গুরুত্ব পাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময়। ফলে, পাঠ্যসূচীর নির্বাচিত অংশ মুখস্থ করে ভাল ফল আশা করবে না কেউ। গৃহশিক্ষক ও নোট বইয়ের সাহায্য নেবার প্রবণতা এতে কমে যাবে।

পরীক্ষার খাতা দেখার সময় প্রতিটি প্রশ্নের জবাব পৃথকভাবে যাচাই করা হয় বর্তমানে। এর ফলে যে পরীক্ষার্থী একটি প্রশ্নে খুব অল্প নম্বর পেল, সে অন্য একটি প্রশ্নে অনেক বেশি নম্বর পেতেও পারে। বুঝতে হবে আমরা সমগ্র ছাত্রটিকে যাচাই করছি, বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্নভাবে কিছু তথ্য বা প্রশ্নের জবাব জানা নয়। বস্তুত সমগ্র খাতাটি পড়ে একটি সামগ্রিক বিচার অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

পরীক্ষার্থীর মেধার মূল্যায়নের বর্তমান ব্যবস্থায় একটি বিষয়ে ফেল করলে পরীক্ষার্থীকে সার্বিকভাবে অকৃতকার্য বলে ঘোষণা করা হয়। এ ক্ষেত্রে বরং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বা গ্রেড উল্লেখ করে পৃথকভাবে পাস করান যেতে পারে। কিন্তু একটি বিষয়ের কতকগুলো প্রশ্নে অসম্ভব অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েও, অন্য প্রশ্নগুলোতে উচ্চ নম্বর লাভ বেশি অসঙ্গতিপূর্ণ। সমন্বিতভাবে খাতাকে যাচাই করার জন্য পরীক্ষককে অবশ্যই অত্যন্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং চিন্তাশীল হতে হবে। যে কথা আগেই উল্লেখ করেছি— পরীক্ষার্থীর সামগ্রিক মন ও পরীক্ষকের সামগ্রিক মনের মধ্যে অনুরণন ঘটতে হবে।

একজন শিক্ষার্থীর মেধা যাচাই করে প্রাপ্ত নম্বর দ্বারা তা প্রকাশিত হয়। কিন্তু একটি নম্বরের মধ্যে এক এককে বা এক বিট তথ্য থাকে। অন্যদিকে একটি বিষয়ে পরীক্ষার্থীর পারদর্শিতা একটি বহুমাত্রিক ব্যাপার। শিক্ষার্থীর প্রবণতা, জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা, সৃজনশীলতা, অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ, বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো পৃথক পৃথক তথ্য বহন করে শিক্ষার্থী সম্পর্কে। এই বহুমাত্রিক তথ্যকে একটি নম্বরে প্রতিফলিত করার মধ্যে মারাত্মক সংক্ষেপণ আছে। এর অর্থ অনেক বিট তথ্য পরীক্ষার ফলের মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু ও কথাটি অত্যন্ত ব্যতিক্রমী মনে হবে সবার কাছে জানি। যদি নম্বর তালিকায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হয়, অন্তত পরীক্ষার ফলের এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ একটি ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পন্ন পরীক্ষার ফলকে সব কিছুর পরিমাপ বলে গণ্য করা উচিত নয়। যেখানে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে, শিক্ষকের সংখ্যা, শিক্ষার মান এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে বিনিয়োগকৃত সময় ও শ্রম সীমিত, সেখানে এই মুহূর্তে পরীক্ষা ব্যবস্থা বা পদ্ধতিকে নির্ভুল ত্রুটিমুক্ত করা হয়তো সম্ভব হবে না। কিন্তু সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো— পরীক্ষার ফল ও সার্টিফিকেট পরীক্ষার যোগ্যতা সম্পর্কে যতটুকু তথ্য নির্ভরযোগ্য ও পরিমাণগতভাবে ধারণ করে, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব আমরা এর উপরে চাপাচ্ছি। অর্থাৎ পরীক্ষার ফল অতি ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন বোর্ডে পরীক্ষার্থীদের যে ক্রমিক মেধা তালিকা তা কি নির্ভরযোগ্যভাবে বা নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা যায়? পরীক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তার কথা হিসাব করলে? যদি না যায়, তাহলে এদের কে বিভিন্ন গ্রেডে ভাগ করে দেখালে অসুবিধা কোথায়?

বস্তুতপক্ষে প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি মেধাগত অবস্থান তুলে দিলে, মেধাবী ছাত্ররা ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা ছেড়ে অনেকটা নিশ্চিত ও স্বাধীনভাবে তাদের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত ও গভীর করতে পারত। তাদের চিন্তা করবার ও সৃজনশীল কাজে অংশ নেবার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, বৃত্তিলাভ বা চাকরির ক্ষেত্রে পৃথক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন ঘটতে পারে। মোট কথা পাবলিক পরীক্ষার ওপর থেকে চাপ কমাতে হবে একে অসততার হাত থেকে রক্ষা করতে। বস্তুত সৃজনশীল কোন কর্মক্ষেত্রে— এমনকি ক্রীড়াবিদ সঙ্গীতকার বা চিত্রশিল্পীকে যাচাই করতে পরীক্ষার নম্বর নয় বরং নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সাফল্য দেখিয়ে টিকে থাকতে হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট একমাত্র মাপকাঠি রূপে ব্যবহৃত হবার ফলে একে অসাধুভাবে অর্জনের প্রবণতা এত বেশি। আমাদের দেশে সার্টিফিকেট বাজারের নোটের মতোই মালিক নিরপেক্ষভাবে মূল্যপ্রাপ্ত। সেই জন্যই একে অসাধুভাবে অর্জন করলেও একে ব্যবহার করতে অসুবিধা হয় না। পরীক্ষায় অসাধুতা ও বিশৃঙ্খলা সামাজিক দুর্নীতির ওপর যেখানে নির্ভরশীল, সেখানে শুধু প্রশাসনিক কৌশল এবং নিয়মের কঠোরতা বৃদ্ধি করে তা দূর করা সম্ভব নয়। কর্মক্ষেত্রে জ্ঞানবৃদ্ধি, সৃজনশীলতা ও দক্ষতার মূল্য না থাকলেও, প্রয়োজন না থাকলে মিথ্যা সার্টিফিকেটের লোভে অসাধুতা [illegible]